আল ইরশাদ-সহীহ আকীদার দিশারী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ কয়েক প্রকার বড় শিরকের বর্ণনা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ ড. ছলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

৪) في الطاعة الشرك আনুগত্যের মধ্যে শিরক (প্রথম অংশ)

আল্লাহ আমাকে এবং আপনাদেরকে তাওফীক দিন! জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করার ক্ষেত্রে অথবা তিনি যা হালাল করেছেন, তা হারাম করার ক্ষেত্রে আলেম ও শাসকদের আনুগত্য করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

‘‘তারা আল্লাহকে পরিহার করে তাদের পন্ডিত ও পুরোহিতদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারইয়ামের পুত্র মসীহকেও। অথচ তাদেরকে শুধু এ আদেশ করা হয়েছিল যে, তোমরা শুধু এক মাবুদের ইবাদত করবে। তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য মাবুদ নেই। তিনি তাদের অংশী স্থির করা থেকে পবিত্র’’। (সূরা আত তাওবা: ৩১)

সহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, আদী ইবনে হাতিম আত-তায়ী যখন মুসলিম হয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসলেন, তখন তিনি উপরোক্ত আয়াত পাঠ করেছিলেন। আদী ইবনে হাতিম তখন বললেন,

يارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ قَالَ: أَلَيْسَ يحلون لكم مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتَسْتَحِلُّونَه ويُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتُحَرِّمُونَهُ قال: بَلَى قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: فَتِلْكَ عِبَادَتُهُم

‘‘হে আল্লাহর রসূল! আমরা তো তাদের ইবাদত করতাম না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তারা তাদের ইবাদতই করে। কেননা আহলে কিতাবদের আলেমরা যখন আল্লাহর হারাম করা বস্তুকে তোমাদের জন্য হালাল করতো, তখন তোমরা কি তা হালাল মনে করতেনা? এমনি তারা যখন আল্লাহর হারাম করা জিনিসকে তোমাদের জন্য হারাম করতো, তখন তোমরা কি আলেমদের অনুসরণ করে তাকে হারাম মনে করতে না? আদী বললেন, হ্যাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটিই হচ্ছে তাদের ইবাদত’’। ইমাম তিরমিযী এবং অন্যান্য ইমামগণ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।[1]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীছে ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের পন্ডিত ও পুরোহিতদেরকে আল্লাহর বদলে প্রভু হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এর অর্থ এ নয় যে, তারা তাদের পন্ডিত ও পুরোহিতদেরকে রুকু ও সিজদাহ করতো। বরং তারা কেবল হারামকে হালাল আর হালালকে হারাম করার মাধ্যমে আল্লাহর হুকুম পরিবর্তন ও রদবদল করার ক্ষেত্রে তাদের পন্ডিতদের অনুসরণ করতো। আর এটিকেই আল্লাহর পরিবর্তে তাদের ইবাদত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। কেননা তারা শরী‘আত প্রবর্তনের ব্যাপারে আল্লাহর স্থানে নিজেদেরকে বসিয়েছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে যারা তাদের অনুসরণ করবে, তারা শরী‘আত প্রবর্তন এবং হালাল ও হারাম করার ক্ষেত্রে তাদেরকে আল্লাহর শরীক হিসাবে গ্রহণ করলো। আর এটি বড় শিরকের পর্যায়ভুক্ত।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

“অথচ তাদেরকে শুধু এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তোমরা শুধু এক মাবুদের ইবাদত করবে। তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য মাবুদ নেই। তিনি তাদের অংশী স্থির করা থেকে পবিত্র”। (সূরা আত তাওবা: ৩১)

অনুরূপ অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾

“যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; এগুলো ভক্ষণ করা গুনাহ্। আর নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়। কিন্তু যদি তোমরা তাদের আনুগত্য করো তাহলে অবশ্যই তোমরা মুশরিক হবে”। (সূরা আল আনআম: ১২১)

শাসক ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ হারামকে হালাল করার ক্ষেত্রে শরী‘আতের হুকুম-আহকাম বিরোধী সমাজে প্রচলিত যেসব আইনের আশ্রয় নেয়, তাতে শাসকদের আনুগত্য করাও বড় শিরক। যেমন-

- সুদের বৈধতা দেয়া,
- যেনা-ব্যভিচারের অনুমোদন দেয়া,
- মদ্যপান অনুমোদন করা,
- উত্তরাধিকার সূত্রে নারী-পুরুষকে সমান করে দেয়া,
- নারীদেরকে বেপর্দা হওয়ার অনুমতি দেয়া,
- সহশিক্ষা চালু ও কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার পরিবেশ তৈরী করা,
- কিংবা হালালকে হারাম করা যেমন পুরুষের জন্য একাধিক বিবাহ হারাম করা অনুরূপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমকে পরিবর্তন করা এবং শয়তানের প্রচলিত আইন-কানুন দ্বারা আল্লাহর হুকুমকে বদলানোর ক্ষেত্রে শাসকদের আনুগত্য করাও বড় শিরক।

সুতরাং যারা এসব ক্ষেত্রে শাসকদের আনুগত্য করবে, তাতে সন্তুষ্ট থাকবে এবং তাদের অনৈসলামিক কাজগুলোকে ভালো মনে করবে সে মুশরিক ও কাফির হিসাবে গণ্য হবে। আমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এমনি ফিকাহ শাস্ত্রের আলিমদের যেসব কথা কুরআন ও হাদীছের সুস্পষ্ট দলীলের বিপরীত ঐসব কথাতে তাদের অনুসরণ করাও বড় শিরক। বিশেষ করে যখন জানা যাবে যে, কিছু লোকের প্রবৃত্তি ও মনোবাসনা পূরণ করতে গিয়েই আলিমগণ ঐসব কথা বলেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে সুযোগের সন্ধানী অর্ধশিক্ষিত কতিপয় লোককে এমনই করতে দেখা যায়।

মোটকথা মুজতাহিদদের ঐসব কথাই গ্রহণ করা আবশ্যক, যার পক্ষে কুরআন-সুন্নাহর দলীল রয়েছে। তাদের যেসব কথা দলীল বিরোধী তা পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

ইমামগণ বলেছেন, كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم “প্রত্যেকের কথা থেকে গ্রহণ করা হবে এবং কিছু বর্জনও করা হবে। একমাত্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সব কথাই গ্রহণ করা হবে। ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোনো হাদীছ আসলে তা আমরা মাথা পেতে মেনে নিবো এবং চোখ বন্ধ করে সেটা কবুল করবো, সাহাবীদের থেকে কোনো হাদীছ আসলে তা আমরা মাথা পেতে মেনে নিবো এবং চোখ বন্ধ করে সেটা কবুল করবো। আর তাবেঈদের থেকে যখন কোনো হাদীছ আসবে, সে ব্যাপারে কথা হলো তারাও পুরুষ এবং আমরা পুরুষ। অর্থাৎ তা আমরা চোখ বন্ধ করে মানতে বাধ্য নই। তাদের কথা ভুলের উর্ধ্বে নয়। ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ তার কথা দ্বারা তার অনুরূপ অন্যান্য আলেম ও বড় ইমামদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন।

ইমাম আবু হানীফার শেষোক্ত কথাটিকে কতিপয় আধা শিক্ষিত লোক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে নিজেদেরকে মুজতাহিদদের কাতারে দাঁড় করিয়েছে। অথচ তারা এখনো মূর্খই রয়ে গেছে। ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ তার কথা দ্বারা আলেমদেরকে জাহেলদের বরাবর করতে চান নি। ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ বলেন,

كلنا رادٌّ ومردود عليه؛ إلا صاحب هذا القبر ... "؛ يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم.

‘‘এ কবরের অধিবাসী ব্যতীত আমাদের প্রত্যেকের কথাই কখনো গ্রহণযোগ্য হয় আবার কখনো অগ্রহযোগ্য হয়। কেবল এ কবরবাসী ব্যতীত। এ কথা বলে তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

إذا صح الحديث فهو مذهبي

সহীহ হাদীছই আমার মাযহাব। তিনি আরো বলেন,

إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط

আমরা কথা যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার বিপরীত হবে, তখন আমার কথাকে দেয়ালে নিক্ষেপ করবে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

عجب لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان

ঐসব লোকের জন্য আফসোস! যারা হাদীছের সনদ এবং সেটার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জেনেও সুফিয়ান ছাওরীর মতামত গ্রহণ করে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

‘‘যারা রসূলের আদেশের বিরোধিতা করে, তাদের এ ভয় করা উচিত যে, তাদের উপর কোনো ফিতনা কিংবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এসে পড়তে পারে’’। (সূরা আন নূর: ৮৩)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার আশঙ্কা হয় যে, তোমাদের উপর আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষিত হবে। আমি বলছি, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আর তোমরা বলছো যে, আবু বকর বলেছেন এবং উমার বলেছেন।[2]

শাইখ আব্দুর রাহমান ইবনে হাসান রহিমাহুল্লাহ কিতাবুত তাওহীদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল মাজীদে বলেন, প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিমের উপর আবশ্যক হলো, তার কাছে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের দলীল পৌঁছার পর যখন সে সেটার অর্থ ভালোভাবে বুঝবে, তখন সেটাকেই যথেষ্ট মনে করবে ও সে অনুযায়ী আমল করবে। যদিও এতে বিরোধীরা তার বিরোধীতা করে। তিনি আরো বলেন, নিজের কল্যাণকামী কোনো লোক যখন আলেমদের কিতাব পড়বে, তাতে নযর দিবে এবং তাদের কথা বুঝতে পারবে তখন সে যেন আলেমদের কথাগুলোকে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের সাথে মিলিয়ে দেখে। কেননা প্রত্যেক মুজতাহিদ আলেম, তার অনুসারী এবং তার দিকে নিজেকে সম্বন্ধকারী মতভেদপূর্ণ মাস‘আলায় নিজেদের মতো ও তার পক্ষে দলীল উল্লেখ করে থাকে। আর উক্ত মাস‘আলাতে একজনের কথাই সত্য হয়। ইমামগণ তাদের ইজতেহাদের কারণে ছাওয়াবপ্রাপ্ত হবেন।

এ ক্ষেত্রে সঠিক পথ অবলম্বনকারী হবে ঐ ব্যক্তি, যিনি আলেমদের কথায় দৃষ্টি দেয়, তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার মাধ্যমে বিভিন্ন মাসাআলা জানা ও মুখস্ত করার চেষ্টা করে এবং তারা যেসব দলীল উল্লেখ করেছেন, তার মাধ্যমে ভুল মাস‘আলা থেকে সঠিক মাসআলা আলাদা করে। এর মাধ্যমেই দলীলের ভিত্তিতে আলেমদের কথা থেকে বাছাই করে সঠিক কথাটির উপর আমল করে সৌভাগ্যবান হতে পারবে। শাইখ আব্দুর রাহমান ইবনে হাসান

আল্লাহ তা‘আলার এ বাণী,

﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾

‘‘কিন্তু যদি তোমরা তাদের আনুগত্য করো তাহলে অবশ্যই তোমরা মুশরিক হবে’’। সূরা আল আনআম: ১২১।

এর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, মুকাল্লিদ এবং যারা তাদের তাকলীদ করে, তাদের অনেকেই এ ফিতনায় পড়েছেন। মুকাল্লাদ বা যার তাকলীদ করা হয়, তিনি দলীলের বিপরীত করলেও মুকাল্লিদরা দলীলের মূল্যায়ন না করার কারণেই ফিতনায় পড়েছে। আর এটি বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

মুকাল্লিদদের কেউ কেউ তাকলীদ করতে গিয়ে এতে বাড়াবাড়ি করে এবং বিশ্বাস করে যে, এ অবস্থায় দলীলের অনুসরণ করতে যাওয়া মাকরুহ অথবা হারাম। মুকাল্লিদরা আরো বলে, আমাদের ইমামগণই দলীল সম্পর্কে অধিক অবগত রয়েছেন। এরা এক বিরাট ফিতনায় পড়েছে। শাইখ আব্দুর রাহমান ইবনে হাসানের কথা এখানেই শেষ।

আমাদের সম্মানিত শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব কিতাবুত তাওহীদের ৩৭ম অধ্যায়ের ৫নং মাসআলায় বলেছেন: অবস্থা এ পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, অধিকাংশের নিকট পাদ্রী ও পীর-মাশায়েখদের ইবাদত করাই সর্বাধিক উত্তম আমলে পরিণত হয়েছে। লোকেরা এটিকে ‘বেলায়াত’ হিসাবে নামকরণ করছে। পাদ্রীদের ইবাদতই বর্তমানে ইলম ও ফিকাহ হিসাবে গণ্য হচ্ছে। পরবর্তীতে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করে এবং খারাপ লোকদেরও ইবাদত শুরু হয়। অর্থাৎ জাহেল ও মূর্খদেরও ইবাদত শুরু হয়। শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব রাহিমাহুল্লাহুর কথা এখানেই শেষ।

গোমরাহ আলেমরা আল্লাহর দীনের মধ্যে যেসব বিদআত, কুসংস্কার এবং গোমরাহী উদ্ভাবন করেছে, তাতে তাদের আনুগত্য করা এবং ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের দ্বারা তাদের পন্ডিত ও পুরোহিতদেরকে প্রভু বানিয়ে নেয়া একই কথা। যেমন মীলাদ অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন করা, সুফী তরীকাসমূহ, মৃতদের মধ্যস্থতা দেয়া এবং আল্লাহ তা‘আলার বদলে তাদের কাছে দু‘আ করা ইত্যাদি। পরিস্থিতি এতদূর গিয়ে পৌঁছেছে যে, গোমরাহ আলেমগণ এমন এমন শরী‘আত তৈরি করেছে, যা আল্লাহ তা‘আলা অনুমোদন করেননি। সহজ-সরল মূর্খ লোকেরা তাদের তাকলীদ করে

এগুলোকেই দীন মনে করছে। এখন সমস্যা হলো, যে এ শিরক-বিদআতগুলোর প্রতিবাদ করে এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করার আহবান জানায় তাকে ইসলামের বাইরে গণ্য করা হয় অথবা তার নামে অপবাদ দেয়া হয় যে, সে আলেম ও সৎ লোকদেরকে ঘৃণা করে। এতে ভালো কাজ খারাপ এবং খারাপ কাজ ভালো রূপ ধারণ করছে। সুন্নাতকে বিদআত এবং বিদআতকে সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে। এর উপরই শিশুরা যুবক হচ্ছে এবং যুবকরা বৃদ্ধ হচ্ছে। এঅবস্থা দীনের অনুসারী কম হওয়ার প্রমাণ এবং দীনকে সংস্কারকারী দাঈদের সংখ্যাও কম হওয়ার প্রমাণ। মহান আল্লাহ তা‘আলার সাহায্য ব্যতীত অন্যায় থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই এবং তার শক্তি ও সাহায্য ব্যতীত সৎকাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

মুজতাহিদ ইমামগণ যেসব ইজতেহাদী মাসআলায় ভুল করেছেন, তাদের ভুলগুলো মার্জণীয় এবং অনিচ্ছকৃত ভুলের কারণে তারা ছাওয়াবও পাবেন। তাদের ভুলগুলোর ক্ষেত্রে যদি তাদের অনুসরণ করা হারাম হয়, তাহলে কবর এবং অলী-আওলীয়ার পূজায় লিপ্ত গোমরাহ-মিথ্যুক দাজ্জালদের তাকলীদ কিভাবে বৈধ হতে পারে? এরা এমন মাসআলায় ভুল করেছে, যাতে ইজতেহাদ করা জায়েয নেই। আর এটি হলো আকীদার মাসআলা। কুরআন ও সুন্নাহর দলীলের ভিত্তিতেই আকীদা সাব্যস্ত করতে হবে। তবে যাদের অন্তর অন্ধ তারা তো কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আকীদা গ্রহণ করবে না। যেমন-আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾

‘‘আমি তো মানুষের জন্য এ কুরআনে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে দিয়েছি। তুমি যে কোনো নিদর্শনই আনো না কেন, অবিশ্বাসীরা এ কথাই বলবে, তোমরা মিথ্যাশ্রয়ী। এভাবে জ্ঞানহীনদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দেন। কাজেই তুমি সবর করো, অবশ্যই আল্লাহর প্রতিশ্রম্নতি সত্য এবং যারা বিশ্বাস করে না তারা যেন কখনোই তোমাকে গুরুত্বহীন মনে না করে’’। (সূরা আর রূম: ৫৮-৬০)

এসব লোক দীনের মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখাগুলোর ব্যাপারে তাদের শাইখদের অন্ধ তাকলীদে ডুবে রয়েছে। আরেক দল লোক তাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা সবাইকে মুজতাহিদ মনে করে। যেসব মূর্খ নিজে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে না এবং ইলমের ক্ষেত্রে যাদের বেশি একটা দখল নেই। তারা ফিকহার কিতাবসমূহ পড়া হারাম মনে করে। তারা চায় মূর্খরাও মুজতাহিদ হয়ে যাক এবং ইজতেহাদ করে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নিজেরাই হুকুম বের করুক। এটি খুবই ঘৃণ্য বাড়াবাড়ি। উম্মতের উপর এদের ক্ষতির আশঙ্কা বেশি না হলেও কোনো অংশেই প্রথমোক্ত দলের চেয়ে কম নয়।

দীনের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাই সর্বাধিক নিরাপদ। আমরা ফকীহদের অন্ধ তাকলীদ করবো না। তবে তাদের ইলমকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখবো না এবং কুরআন ও সুন্নাহর দলীলের ভিত্তিতে তারা যেসব কথা বলেছেন, তা আমরা মোটেই বর্জন করবো না। বরং আমরা তাদের কথা দ্বারা উপকৃত হবো এবং কুরআন ও সুন্নাহ বুঝতে তাদের বক্তব্যগুলোর সাহায্য নিবো। কেননা দীন ইলমের ক্ষেত্রে এগুলো আমাদের জন্য বিরাট সম্পদ এবং ইলমে ফিকহার বিরাট এক ভান্ডার। এগুলো থেকে যা দলীল মোতাবেক হয়, তা আমরা গ্রহণ করবো এবং যা দলীল বিরোধী হয়, তা বর্জন করবো। সালাফে সালেহীনগণ তাই করতেন। বিশেষ করে সাম্প্রতিক কালে ইলম অর্জনে যেখানে মানুষের আগ্রহ-উদ্দীপনায় ভাটা পড়েছে, মূর্খতা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তাই মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা জরুরী। কড়াকড়ি ও শৈথিল্য প্রদর্শন করা যাবে না এবং বাড়াবাড়ি ও ঢিলামি করা যাবে না। আমরা

আল্লাহর কাছে দু‘আ করি তিনি যেন, পথভ্রষ্ট মুসলিমদেরকে সঠিক পথ দেখান, তাদের ইমাম ও নেতাদেরকে হকের উপর দৃঢ়পদ রাখুন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও বান্দার আহবানে সাড়া দানকারী।

হারামকে হালাল করার ক্ষেত্রে এবং হালালকে হারাম করার ক্ষেত্রে আলেমদের আনুগত্য করা যেমন জায়েয নেই, তেমনি ইসলামী শরী‘আত বর্জন করে অন্য কিছু দিয়ে যেসব আমীর-উমারা ও শাসকগোষ্ঠি মানুষকে শাসন করে তাদের আনুগত্য করাও বৈধ নয়। সকল দ্বন্দ্ব-কলহ, ঝগড়া-বিবাদ, পারস্পরিক বিরোধ নিষ্পত্তি করতে এমনকি মানব জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের স্মরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। এটিই একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত ও তাওহীদের দাবি। কেননা হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান দেয়া একমাত্র আল্লাহর অধিকার। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾

“জেনে রাখো, সৃষ্টি তারই এবং নির্দেশও তার”। সূরা আল আরাফ:৫৪

অর্থাৎ আল্লাহই হুকুমকারী এবং হুকুম করার একমাত্র অধিকার তারই। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾

“তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করো, তার ফায়সালা আল্লাহর নিকটেই”। (সূরা শুরা: ১০)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

“তোমরা যদি কেনো বিষয়ে মতবিরোধ করো, তাহলে বিতর্কিত বিষয়টি আল্লাহ এবং রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি ঈমান এনে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম”। (সূরা আন নিসা: ৫৯)

সুতরাং শুধু ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যই নয়; বরং আল্লাহর শরী‘আত দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করা একদিক থেকে যেমন প্রথম শ্রেণীর ইবাদত, অন্যদিকে এটি আল্লাহ তা‘আলার অধিকার এবং ইসলামী আকীদারও অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং শাসন ও বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে যারা আল্লাহর শরী‘আত বাদ দিয়ে অন্যান্য রীতি-নীতি এবং মানুষের তৈরী প্রচলিত প্রথা ও আইন-কানুনের স্মরণাপন্ন হয়, তারা উপরোক্ত প্রচলিত প্রথা-রীতি-নীতি ও তা দিয়ে শাসনকারীদেরকে শরী‘আত প্রবর্তন ও হুকুম-আহকাম প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর শরীক নির্ধারণ করলো।[3]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾

“এদের কি এমন কিছু শরীক রয়েছে, যারা এদের জন্য দীনের এমন বিধি-বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছে আল্লাহ যার অনুমতি দেন নি?” (সূরা শুরা: ২১)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾

‘‘কিন্তু যদি তোমরা তাদের আনুগত্য করো তাহলে অবশ্যই তোমরা মুশরিক হবে’’। (সূরা আনআম: ১২১)

যারা আল্লাহর শরী‘আত বাদ দিয়ে অন্যান্য আইন-কানুনের কাছে বিচার-ফায়ছালা নিয়ে যায়, তাদের থেকে আল্লাহ তা‘আলা ঈমান নাকোচ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

‘‘তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তারা সে সমস্ত বিষয়ের উপর ঈমান এনেছে। তারা বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো সমাধানের জন্য তাগুতের কাছে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়। আর যখন তুমি তাদেরকে বলবে, তোমরা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এবং তার রসূলের দিকে এসো তখন তুমি মুনাফেকদিগকে দেখবে, ওরা তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে সরে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় যদি তাদের কৃতকর্মের দরুন বিপদ আরোপিত হয়, তখন কেমন হবে? অতঃপর তারা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে ফিরে আসবে যে, কল্যাণ ও সমঝোতা ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এরা হলো সে সমস্ত লোক, যাদের মনের গোপন বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা অবগত। অতএব, তুমি ওদেরকে উপেক্ষা করো এবং ওদেরকে সদোপদেশ দিয়ে এমন কথা বলো, যা তাদের জন্য কল্যাণকর। বস্তুত আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়। আর সেসব লোক যখন নিজেদের অনিষ্ট সাধন করেছিল, তখন যদি তারা তোমার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রসূলও যদি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতো, অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও মেহেরবান রূপে পেত। অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবেনা, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কেনো রকম সংকীর্ণতা পাবেনা এবং তা সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল করে নিবে’’। (সূরা আন নিসা: ৬০-৬৫)

সুতরাং যারা মানুষের তৈরী আইন-কানুনের দিকে আহবান জানায়, তারা আনুগত্য এবং শরী‘আত প্রবর্তনের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করলো। আর যে ব্যক্তি এই মনে করে আল্লাহর নাযিল করা শরী‘আত পরিত্যাগ করে অন্যান্য আইন-কানুন দিয়ে শাসন করে যে, আল্লাহ তা‘আলার নাযিল করা শরী‘আতের চেয়ে এগুলোই ভালো অথবা মানুষের তৈরী আইন-কানুন ও রীতিনীতি আল্লাহর শরী‘আতের সমমর্যাদা সম্পন্ন অথবা আল্লাহর শরী‘আত বাদ দিয়ে অন্য কিছু দিয়ে শাসন করা জায়েয আছে, তাহলে সে কাফের হিসাবে গণ্য হবে। যদিও সে নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে।

কেননা যারা আল্লাহ তা‘আলার শরী‘আত বর্জন করে অন্যান্য আইন-কানুনের কাছে বিচার-ফায়ছালা নিয়ে যায় এবং নিজেদেরকে মুমিন বলে দাবি করে, আল্লাহ তা‘আলা ঈমানের দাবিতে তাদেরকে মিথ্যুক বলেছেন। আল্লাহ

তা‘আলার বাণী, يزعمون তাদের ঈমান নাকোচ হওয়ার দাবি করে। কেননা এ শব্দটি ঐ ব্যক্তির দিকে সম্বন্ধ করে বলা হয়, যে কোনো জিনিস দাবি করে, অথচ সে সেটাতে মিথ্যাবাদী। আর প্রচলিত আইন-কানুন দ্বারা বিচার-ফায়ছালা ও শাসন করা এবং তাগুতের কাছে বিচার-ফায়ছালার জন্য যাওয়া একই কথা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

‘‘যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল, যা বিচ্ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা’’। (সূরা আল বাকারা: ২৫৬)[4]

সুতরাং যারা মানুষের প্রচলিত আইন-কানুন দিয়ে শাসন করবে আর যারা মন খুলে খুশি হয়ে উত্তম মনে করে তার প্রতি অনুগত থাকবে তাদের কেউই তাওহীদপন্থী নয়। কেননা তারা শরী‘আত প্রবর্তন ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে এবং যে তাগুতকে অস্বীকার করতে বলা হয়েছে, তা বর্জন করেনি। বরং সে শয়তানের আনুগত্য করেছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

‘‘পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে বহুদূরের গোমরাহীতে নিক্ষেপ করতে চায়’’। সূরা আন নিসা:৬০।

আল্লাহ তা‘আলা এখানে সংবাদ দিয়েছেন যে, মুনাফিকদেরকে যখন আল্লাহ তা‘আলার শরী‘আতের কাছে বিচার-ফায়ছালা নিয়ে যাওয়ার জন্য আহবান করা হয়, তখন তারা এদিকে আসতে অস্বীকার করে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। এমনি তাদের বিকৃত স্বভাব এবং অন্তর নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে তারা ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করাকেই সংস্কার হিসাবে দেখে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ﴾

‘‘তাদেরকে যখন বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, মূলত আমরাই সংশোধনকারী। সাবধান! এরাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী, তবে তারা এ ব্যাপারে সচেতন নয়’’। (সূরা আল বাকারা: ১১)

সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত অন্যের নিকট বিচার-ফায়ছালা নিয়ে যাওয়া মুনাফেকদের কাজ। এটি পৃথিবীতে বিপর্যয়ের অন্যতম বৃহৎ কারণ।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় অধিকাংশ মুফাস্সির বলেন, রসূল প্রেরণ, শরী‘আতের হুকুম-আহকাম বর্ণনা এবং আল্লাহ তা‘আলার আনুগত্যের দাওয়াত দেয়ার মাধ্যমে পৃথিবীকে পরিশুদ্ধ করার পর তোমরা পাপাচার, সীমালংঘন, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের আনুগত্যের দিকে মানুষকে আহবান করার মাধ্যমে সেটাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করোনা। কেননা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের দিকে আহবান করা এবং তার সাথে শিরক করা পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ ফাসাদ সৃষ্টি করার নামান্তর। প্রকৃতপক্ষে শিরক এবং আল্লাহ তা‘আলার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণেই পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। সুতরাং আল্লাহর সাথে শিরক করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের দিকে দাওয়াত দেয়া, আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে মাবুদ হিসাবে দাঁড় করানো এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য কাউকে আনুগত্য ও অনুসরণ করার জন্য নির্ধারণ করাই

পৃথিবীতে ফাসাদ ও ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার কারণ। আল্লাহ তা'আলাকে যতক্ষণ না একমাত্র মাবুদ হিসাবে গ্রহণ করা হবে, তার দিকেই কেবল আহবান না করা হবে এবং আনুগত্য ও অনুসরণ যখন একমাত্র রসূলের জন্যই না হবে ততোক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবী এবং এর অধিবাসীগণ পরিশুদ্ধ হবে না।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্যদের আনুগত্য করা কেবল তখনই ওয়াজিব হবে, যখন তারা রসূলের আনুগত্যের আদেশ দিবে। আর যখন তারা রসূলের নাফরমানী করা এবং তার শরী'আতের বিরোধীতা করার আদেশ দিবে তখন তাদের কথা শ্রবণ করা যাবে না এবং তাদের আনুগত্যও করা যাবে না।

যে ব্যক্তি পৃথিবীর অবস্থা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে, সে দেখতে পাবে যে, আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ, তার ইবাদত এবং তার রসূলের ইবাদতের কারণেই তা সংশোধন হয়েছে। আর সৃষ্টিজগতে যত অকল্যাণ, ফিতনা, বালা- মুছীবত, অনাবৃষ্টি, শত্রুদের বাড়াবাড়ি যুলুম ইত্যাদি রয়েছে তা রসূলের বিরুদ্ধচারণ, আল্লাহ এবং তার রসূল ব্যতীত অন্যের দিকে আহবান করার কারণেই হয়ে থাকে।

যেসব হুকুম-আহকাম ও বিচার-ফায়ছালা আল্লাহ তা'আলার হুকুমের পরিপন্থী ও বিরোধী তাকে তিনি জাহেলীয়াতের হুকুম বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

‘‘তারা কি জাহেলী যুগের ফায়ছালা কামনা করে? বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম ফায়ছালাকারী আর কে আছে?’’ (সূরা আল মায়েদা: ৫০)

ইমাম ইবনে কাছীর রহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহ তা'আলার হুকুম ও বিধানের মধ্যেই রয়েছে সমস্ত কল্যাণ এবং তাতেই রয়েছে সমস্ত অকল্যাণ থেকে নিরাপত্তা। যারা আল্লাহ তা'আলার এসব কল্যাণকর হুকুম-আহকাম ও বিধি-নিষেধ থেকে সরে এসে বিভিন্ন মত, প্রবৃত্তি এবং আল্লাহর শরী'আতের দলীল ছাড়াই মানুষের তৈরী বিভিন্ন পরিভাষার অনুসরণ করে আল্লাহ তা'আলা তাদের নিন্দা করেছেন। জাহেলী যুগের লোকেরা এসব অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ভ্রান্ত মতবাদগুলো দিয়েই বিচার-ফায়ছালা করতো।

তাতারীরা চেঙ্গিস খানের তৈরী যেসব রীতিনীতি ও আইন-কানুন দ্বারা মুসলিম জনগণকে শাসন করেছিল, তাও জাহেলী যুগের রীতিনীতির মতোই ছিল। চেঙ্গিস খান তাতারীদের জন্য ‘আল-ইয়াসিক’ নামক একটি সংবিধান রচনা করেন। এটি হুকুম-আহকাম ও আইন-কানুন সম্বলিত এমন একটি কিতাব, যা বিভিন্ন শরী'আত যেমন ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন কিতাব থেকে কিছু কিছু বিষয় গ্রহণ করে প্রস্ত্তত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে চেঙ্গিস খান নিজের নিজস্ব চিন্তা-গবেষণা এবং প্রবৃত্তির উপর ভিত্তি করেও তাতে অনেক আইন-কানুন যুক্ত করেছে। এ কিতাবটি তার ছেলেরা শরী'আত হিসাবে গ্রহণ করে এবং সেটাকে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের উপর প্রাধান্য দেয়। যে ব্যক্তি চেঙ্গিস খানের মতো কাজ করবে, সে কাফের বলে গণ্য হবে। এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। যতক্ষণ না সে আল্লাহ এবং তার রসূলের হুকুমের দিকে ফিরে আসে এবং কম-বেশি সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত দ্বারা বিচার-ফায়ছালা ও শাসন কার্য পরিচলনা করে।[5] ইমাম ইবনুল কাইয়্যিমের উক্তি এখানেই শেষ।

চলমান...

ফুটনোট

[1]. তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ। ইমাম তিরমিযী, হাদীছটি বর্ণনা করার পর হাসান বলেছেন। ইমাম আলবানী (রহি.) হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন। ইমাম তাবারানীও বিভিন্ন সনদে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। দেখুন: গায়াতুল মুরাম, হাদীছ নং- ৬।

[2] . ছহীহ ও যঈফ সনদে এবং বিভিন্ন শব্দে আব্দুল্লাহ ইবনে আববাসের এ আছারটি আলেমদের নিকট খুবই প্রসিদ্ধ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার উপরে অন্য কারো কথাকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না। ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর আছারটি এ কথাকেই শক্তিশালী করছে। ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকদেরকে তামাত্তো হজ্জকে উত্তম বলতেন। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের বছর সাহাবীদেরকে জোর দিয়ে তা করতে বলেছেন। তাকে যখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কি আমাদের জন্য খাস? নাকি কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য? তিনি বললেন, বরং সকল মানুষের জন্য। সুতরাং ইবনে আব্বাস এ ফতোয়াই প্রদান করতেন। ঐ দিকে আবু বকর ও উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা চাইতেন যে, লোকেরা হজ্জ এবং উমরা আলাদাভাবে করুক। এতে করে আল্লাহর ঘর আবাদ হবে বেশি এবং সবসময়ই কাবা শরীফে লোকের ভিড় থাকবে। সবসময়ই আল্লাহর এবাদত হবে। আর একই সফরে হজ্জের মৌসুমে দু'টি একসাথে করে ফেললে কাবাঘর খালি থাকার আশঙ্কা রয়েছে।

কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এ বিষয়ে আবু বকর ও উমারের খেলাফ করতেন এবং তাদের কথা গ্রহণ করতে লোকদেরকে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন হজ্জ ও উমরা একসাথে করাই উত্তম। লোকেরা তাকে বললো, আপনি লোকদেরকে এমন কাজের আদেশ দিচ্ছেন, যা থেকে আবু বকর ও উমার নিষেধ করছেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার আশঙ্কা হয় যে, তোমাদের উপর আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষিত হবে। আমি বলছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আর তোমরা বলছো, আবু বকর বলেছেন এবং উমার বলেছেন

এখানে জেনে রাখা আবশ্যক যে, এ উম্মতের কেউই জ্ঞান-বুদ্ধিতে আবু বকর ও উমারের সমান নয়। তারা হজ্জ ও উমরা একসাথে করতে লোকদেরকে কেন মানা করতেন, তা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, লোকেরা এক সাথে হজ্জ ও উমরা করে নিলে অন্য সময় কাবা ঘরে লোকদের ভিড় থাকবে না। তাই হজ্জের মাসসমূহে যদি শুধু হজ্জ করা হয় এবং বছরের অন্যান্য সময় উমরা করা হয় তাহলে সারা বছরই কাবা আবাদ হবে এবং তাতে সবসময় লোকদের ভিড় থাকবে। লোকদেরকে তামাত্তো হজ্জ করতে নিষেধ করার মাধ্যমে তা হারাম করেননি। বরং তারা কেবল উত্তম মনে করতেন এবং মানুষের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিতেন। এতেই ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমার আশঙ্কা হয় তোমাদের উপর আল্লাহর তরফ থেকে পাথর বর্ষণ করা হবে। কেননা তোমরা এমন কথা বলছো এবং এমন কাজ করছো যাতে তোমরা আসমান থেকে পাথর বর্ষণের শাস্তির যোগ্য হয়েছো। আমি বলছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জ ও উমরা একসাথে করার আদেশ দিয়েছেন, আর তোমরা আবু বকর ও উমারের কথা টেনে এনে আমার কথার বিরোধীতা করছো।

আব্দুল্লাহ ইবনে আববাসের এ কথা থেকে বুঝা গেলো যে, কোনো মানুষের কথাকে আল্লাহর কথা কিংবা রাসূলের কথার বিরুদ্ধে দাঁড় করানো যাবে না। সে যত বড় আলেমই হোক না কেন। ইবনে আববাসের কথাই সঠিক। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সীরাত ও সুন্নাত প্রমাণ করে যে, কোনো মানুষের কথা মানতে গিয়ে আল্লাহ ও তার রাসূলের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করা যাবে না।

[3]. তবে সাধারণ মুসলিমদের উপর জোর পূর্বক মানব রচিত আইন চাপিয়ে দেয়া হলে তারা যদি অন্তর দিয়ে সেটাকে অপছন্দ ও ঘৃণা করে, চাপের মুখে তা মানতে বাধ্য হয় এবং না মানলে যুলুম-নির্যাতন ও জান-মাল, মান-ইজ্জত ইত্যাদির ক্ষতির আশঙ্কা করে তাহলে ঘৃণাসহকারে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা মেনে নিলে কাফের হবে না।

[4]. মোটকথা তাগুতকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত কারো ইসলাম পরিশুদ্ধ হবে না। কালেমায়ে তাইয়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর মর্মার্থ এটিই। সুতরাং لا إله এ কথার মাধ্যমে আল্লাহর পরিবর্তে প্রত্যেক তাগুতের এবাদত করাকে অস্বীকার করা হয়েছে। আর إلا الله কালেমার এ অংশের মাধ্যমে এবাদতের ক্ষেত্রে কেবল আল্লাহর তাওহীদকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ ‘‘আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। তাঁর মাধ্যমে এ নির্দেশ দিয়েছি যে তোমরা আল্লাহর এবাদত করো, আর তাগুতকে বর্জন করো’’। সুতরাং আল্লাহর এবাদতকে একটি বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। আর তাগুতের এবাদতকে অন্য একটি বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং একজন মানুষ কেবল তখনই মুসলিম বলে গণ্য হবে, যখন সে আল্লাহর এবাদত করবে এবং একই সাথে তাগুত থেকে দূরে থাকবে।

আর طاغوت শব্দের উৎপত্তি হয়েছে الطغيان থেকে। তাগুত বলা হয় এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে, যে অন্যায় ও বিদ্রোহে সীমালংঘন করে। আল্লাহ তা‘আলা মূসা আলাইহিস সালামকে লক্ষ্য করে বলেছেন, ﴿اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ ‘‘এখন তুমি যাও ফেরাউনের কাছে। কেননা সে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে’’। (সূরা তোহা: ২৪) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ

‘‘যখন পানি সীমা অতিক্রম করলো তখন আমি তোমাদেরকে জাহাজে আরোহন করিয়েছিলাম’’। (সূরা আল-হাক্কাহ: ১১) অর্থাৎ পানি যখন অত্যন্ত বেড়ে গেল। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ﴾ ‘‘তাই সামূদ জাতিকে একটি সীমাহীন বিপদ দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে’’। (সূরা আলহাক্কাহ: ৫) অর্থাৎ বিকট ও ভয়াবহ একটি চিৎকারের মাধ্যমে। সুতরাং যে ব্যক্তি বা বিষয় সীমা অতিক্রম করে, তাকেই তাগুত বলা হয়। শয়তানকে আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার কারণে ও সীমালংঘন করার কারণে তাগুত বলা হয়। আল্লাহ ব্যতীত অন্য যেসব মাবুদের এবাদত করা হয়, সেসব মাবুদ যদি উক্ত এবাদতের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে ওগুলোকে তাগুত বলা হয়। যাদুকর এবং গণক উভয়ই তাগুত। এমনি আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেক মাবুদই তাগুত।

[5]. আমরা বহুবার উল্লেখ করেছি যে, কুরআন-সুন্নাহ এবং ইসলামী বই-পুস্তকের যেখানে যুদ্ধ-জিহাদ পরিচলনা করা, মৃত্যুদ- ও বিভিন্ন শাস্তির কথা বলা হয়েছে তা কার্যকর করার দায়িত্ব সাধারণ জনগোষ্ঠী, ব্যক্তি বিশেষ অথবা কোনো সংগঠনকে প্রদান করা হয়নি। তা কেবল মুসলিম শাসক, প্রশাসন ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাজ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খোলাফায়ে রাশেদীন এবং পরবর্তীতে ইসলামের স্বর্ণ যুগসমূহে মুসলিমদের কোনো জামা‘আত বা সাধারণ নাগরিক নিজেদের শাসক শ্রেণীকে ডিঙ্গিয়ে নিজস্ব ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে উপরোক্ত কাজগুলো করেননি। কুরআন-সুন্নাহয় এর সমর্থনে কোনো দলীলও নেই। এরূপ করা হলে কী ধরণের ক্ষতি হতে পারে তাও আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। সুতরাং বিষয়টি ভালো করে বুঝা উচিৎ।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=13217

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন